এই সংখ্যায় ভেতরের পাতায়
√ কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণান
√ জলাভূমি বাঁচাতে অর্ডিন্যান্স
√ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমাধানের সহজ উপায়
√ অরণ্য সপ্তাহে

বিজ্ঞান অন্বেষক

ADMISSION GOING ON
ALBATROSS SCHOOL
(Near- Kanchrapara College)
Contact No. 25855868, 9339425472
Bengali Medium : Nursery– u-IV
English Medium : Nursery– u-VI
Office Hour : 10.00 am–12.30pm

বর্ষ -৩ | প্রথম সংখ্যা | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি /২০০৬ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

কেন হারিয়ে যাচ্ছে?

পাখিরা আকারে ছোট, কথা বলতে পারে না, সেই সুযোগে আমরা তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি চিরকালের জন্য এই পৃথিবী থেকে। ভুল বললাম, পাখিরাও কথা বলে। তবে আমাদের মতো নিষ্ঠুরদের কাছে তাদের ভাষা জোরালো নয়। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে রং-বেরং-এর সুন্দর পালকযুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখিগুলো। যেকোনও ছোট বড় জলাশয়ের ধারে আগে শামুখ খোল, ডাহুক, কাদাখোঁচা, কুঁচবক, সাদাবুক মাছরাঙা, মাছরাঙা, বিভিন্ন বক, হাড়গিলা ইত্যাদি পাখিদের ঝাঁক দেখা যেত।

এরপর ২ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

বাঁশ গাছে ফুল— ডাকে না বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বিশ্বাস : বাঁশগাছে ফুল ফুটলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে।

বিজ্ঞান : বাঁশ একটি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। সারা পৃথিবীতে প্রায় ১২০০টি প্রজাতি আছে এবং শুধু ভারতেই রয়েছে প্রায় ১৩৮টি প্রজাতি। অধিকাংশ প্রজাতিরই জীবদ্দশায় মাত্র একবার ফুল ফোটে, তা থেকে বীজ হয় এবং তারপর বাঁশগাছটি মারা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশগাছে বিভিন্ন

এরপর ৬ পাতায়

ডাইনি হত্যা বেড়েই চলেছে

বর্ধমান জেলা : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, বর্ধমান জেলার ভাতার থানার জামবনি গ্রামের গৃহবধূ লক্ষ্মী টুডুকে (বয়স ৪৫ বছর) কুদৃষ্টির জন্য গ্রামের তিন-চারজন লোক দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন। ডাইনি মন্ত্রের জোরে বেঁচে উঠতে পারে এই ভয়ে ওই মহিলাকে জঙ্গলে নিয়ে দা-র কোপে মাথা কেটে ফেলে দেয়। তদন্ত করে জানা যায়, আদিবাসীদের সামাজিক কুসংস্কারের বলি হন লক্ষ্মী দেবী। ওই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের ধারণা লক্ষ্মী টুডু ডাইনি ছিলেন। গ্রামের লোকেরা অসুখ বিসুখ করলে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ঝাড়ফুঁক করাত।

হুগলী জেলা : ২৩ মার্চ ২০০৪, মগরার দিকশুই গ্রামের 'রাম টুডু'কে ডাইন অপবাদে গ্রামছাড়া করা হয়েছে। রাম টুডুর গ্রামের জমিও গ্রামের লোকেরা দখল করে নেয়, ফলে স্ত্রী-পুত্র সহ দীর্ঘদিন গ্রামের বাইরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হন। পুরো ঘটনা জানিয়ে মগরা থানায় ডায়েরি করেন রাম টুডু, কিন্তু এখনো থানা কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি।

দার্জিলিং (শিলিগুড়ি) : ৩০ আগস্ট ২০০৪, শিলিগুড়ির খড়ি বাড়িতে জবা হেমব্রম নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে ডাইনি সন্দেহে খুন করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই জবা দেবী জ্বরে ভুগছিলেন। গ্রামের এক জানগুরু ছড়িয়ে দেন যে গ্রামে ডাইনি রয়েছে এবং বৃদ্ধাকেই ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধাকে খুন করা হয়।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি : ২৬ মার্চ ২০০৫, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে প্রায়ই ডাইনি অপবাদে খুন হওয়ার ঘটনা শোনা যায়। ২৬ মার্চ কালচিনির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে ডাইনি অপবাদে দুই নিরীহ (বিধবা) বৃদ্ধাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়।

নদীয়া : নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার ফুলবাগান চরগ্রামে শান্তি চৌধুরীকে (বয়স ৪৫ বছর) গ্রামের কয়েকজন এক ওঝার পরামর্শে শান্তিদেবীকে 'ডাইনি' আখ্যা দিয়ে খুন করেছে। ঘটনার অনুসন্ধান করে জানা যায় শঙ্কর চৌধুরীর ছোট ছেলেকে সাপে কামড়ালে গ্রামের সেই ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ঝাড়ফুঁক করে সর্পদষ্ট বালককে ওঝা বাঁচাতে পারেননি। ওঝা পরে গ্রামের লোককে বলেন যে বালককে সাপে ছোবল দেয়নি, সাপবান মারা হয়েছে। তাই বাঁচানো যায়নি। আরও অনুসন্ধান কার জানা যায় যে সেই ওঝা গ্রামের লোকদের বলেন শান্তিদেবী সাপবান মেরে বালককে খুন করেছেন।

মালদহ : ২০ নভেম্বর ২০০৫, ১০ কিমি দুরে রাঙামাটিয়া গ্রামে ডাইনি অপবাদে রাজনন্দিনী দেবীকে গ্রামছাড়া করা হয়। গ্রামে গোপনে সালিসি সভার আয়োজন করে সিদ্ধান্ত হয় যে ওই মহিলাকে গ্রাম ছাড়তে হবে,

এর পর ২ পাতায়

শ্বেত বামনের কথা

রাতের আকাশের দিকে তাকালে অগণিত তারা দেখা যায়। অধিকাংশ মানুষই ভাবে না এদের উৎস, আয়ু, পরিণতি সম্পর্কে। অথচ এদের আড়ালে অজস্র জটিল রহস্য লুকিয়ে আছে। এদের সম্পর্কে এক একটি তথ্য আমাদের চরম বিস্ময়ের জগতে নিয়ে ফেলে। একটা নক্ষত্র তৈরি হতে সময় নেয় কোটি কোটি বছর। জীবিত থাকে আরও কোটি কোটি বছর। তারপর মৃত্যু হতে সময় নেয় আবারও কোটি কোটি বছর। তবে সব নক্ষত্রের মৃত্যু বা অন্তিম পরিণতি একভাবে ঘটে না। কোনও নক্ষত্রের মৃত্যু কীভাবে ঘটবে তা নির্ভর করে নক্ষত্রের প্রারম্ভিক ভরের ওপর।

এর পর ৩ পাতায়

অবাক পৃথিবীর হাওয়া মহল

ওজোনস্তরের সাথে আমাদের সম্পর্ক : শুধু গ্রীনহাউস গ্যাসগুলিই নয়, বায়ুমণ্ডলের প্রায় সব গ্যাসই জীবকুলকে বিভিন্নভাবে উপকার করে। যেমন, আমাদের সাহায্য করে ওজোন। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোনস্তরের ওজোন জীবকুলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এই ওজোনস্তরের ওজোন, সূর্যের অতিবেগুণী রশ্মি (যা জীবকূলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক) শোষণ করে নেয়, পৃথিবীতে পৌঁছতে দেয় না। এই স্তরটি পৃথিবীর জীবজগতকে সূর্যের অতিবেগুণী

এর পর ৫ পাতায়

ডাইনি প্রথা

১ পাতার পর

নতুবা পুড়িয়ে মেরে ফেলা হবে। মূলত এই সিদ্ধান্ত জানার পরই রাজনন্দিনী দেবী তার পরিবার সহ পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবী করেন, আপাতত প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু কতদিন? গ্রামের গুণিন-ওঝারা আবারও ডাইনি অপবাদে খুন করার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর : ২৮ মার্চ ২০০৪, ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা থানা এলাকার মাংরুল গ্রামের আদিবাসী ঝাঁপু টুডুকে (বয়স ৬ বছর) গ্রামের মোড়ল এবং জানগুরুর দল খুন করেন। ঝাঁপুর অপরাধ ছিল পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে নিয়মিত যোগাযোগ করা। গ্রামের কয়েকশত ঝাঁপু এইসব মোড়লদের ও জানগুরুদের ভয়ে পরিবার পরিজন জন্মস্থল ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বাঁচার তাগিদে। সমীক্ষা করে তথ্যসহ জানা গেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ডাইনি হত্যার বিষয়ে কঠোর শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন। চন্দ্রকোণা থানা এলাকায় ডাইনি সন্দেহে গ্রামছাড়া হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ওই গ্রামের কিছু মোড়ল এবং জানগুরুরা টাকা জরিমানা করেন, টাকা দিতে না পারলে গ্রামছাড়া করেন এবং ডাইনি অপবাদে খুন করেন।

পুরুলিয়া : জানগুরুদের দল গ্রামে বিচারসভা করে ডাইনি পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করে। বোকারোর এক জানগুরুর দক্ষিণা ৩০৫১ টাকা, বিচার করে জরিমানা করেন কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা, যদি টাকা দিতে না পারে বাড়ির ধান, চাল, গরু-বাছুর এমনকি জমি বিক্রি করে দিতে হবে। ডাইনি অপবাদে বহু পরিবার গ্রামছাড়া, প্রতিবছরই কয়েকশো মানুষ ডাইনি অপবাদে খুন হয়। বহু ক্ষেত্রে একঘরে হয়ে যায়। পুরুলিয়ার মনিবাহার, হুড়া, বড়গোড়া সহ প্রায় সর্বত্রই ডাইনি সন্দেহে খুন চলছেই। গ্রামের মাতব্বররা বিচার করে ডাইনি সাব্যস্ত করেন।

মুর্শিদাবাদ : ২০ জুলাই ২০০৪, ডোমকলের ইসলামপুর থানার রায়পুর গ্রামের কল্পনা মালকে (বয়স ৪০ বছর) ডাইনি অপবাদে গাছে বেঁধে মারধোর করা হয়। স্থানীয় গ্রামের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে একজন গুণীন যজ্ঞ করে বান ছোড়েন। সেই বান কল্পনাদেবীর গায়ে এসে পড়ে। এরপরই গ্রামবাসীরা গুণিনের কথায় তাকে ডাইনি অপবাদে মারধোর করেন। পরবর্তীকালে মারধোরের হাত থেকে কোনওমতে পুলিশের সহায়তায় প্রাণে বেঁচে যান। খবরে জানা যায় যে দুষ্কৃতীরা এখনও ধরা পড়েনি।

ডাইনি হত্যার পরিসংখ্যান : ১৯৮৭-২০০৩ সাল, সারা দেশে (ভারতে) ডাইনি সন্দেহে ২৫৫৬ জন মহিলাকে পুড়িয়ে, পাথর ছুঁড়ে এবং জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হয়তো বা এর চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি হবে। কারণ পুলিশের কাছে কেশ নথিভুক্ত না হলে সংখ্যাটি সরকারি খাতায় নথিভুক্ত হয় না। আদিবাসী সমাজের মধ্যে ডাইনি হত্যার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে।

ডাইনি হত্যার বিরুদ্ধে সদর্থক কি কি ভূমিকা নেওয়া দরকার—

(১) ডাইনি হত্যা রোধে সরকারী আইন কার্যকরী করার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) আদিবাসী সমাজে যেহেতু এই ডাইনি হত্যার ঘটনা বেশি ঘটে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা খুবই জরুরি, পাশাপাশি সর্বস্তরে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক চেতনা বিকাশ করা আবশ্যক।

(৩) গ্রামাঞ্চলে যেসব অঞ্চলে জানগুরু, ওঝা, গুণিন, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক বেশি মাত্রায় রয়েছে, সেইসব অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পাশাপাশি শিক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনা প্রসার ধারাবাহিকভাবে চালাতে হবে।

(৪) সরকারী প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞানকর্মীদের বিজ্ঞান চেতনা প্রসারমূলক অনুষ্ঠানের প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে। ডাইনি হত্যা একটি সামাজিক অপরাধ—জানগুরু বা ওঝা গুণিনদের অবৈজ্ঞানিকমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য সরকারকে আরও নজরদারীর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে।

(৫) মানুষের মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক বা অতীন্দ্রীয় মতবাদ নারীদের অবদমিত করে রাখার মানসিকতা, চূড়ান্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যেগুলি মানুষকে ডাইনি বিশ্বাসের মত কুসংস্কারকে টিকিয়ে রাখে— এইগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার, পাশাপাশি বিজ্ঞানের জনকল্যাণমুখী আবিষ্কারগুলির সুফল যাতে সর্বস্তরে তথা আদিবাসী সমাজের মধ্যে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আরও একটি বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও শিক্ষার বিকাশ হওয়া খুবই জরুরী।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

পাখিদের কথা

১ পাতার পর

কিন্তু এখন এদের দেখা মেলে না। কেন এরা হারিয়ে যাচ্ছে? একটু খোঁজ নেওয়া যাক, হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলি : এককথায় উত্তর দেওয়া যায় এরা হারিয়ে যাচ্ছে এদের উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে। বিস্তারিত কারণগুলি এইরূপ :

(১) বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়া, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় নিঃশেষ হওয়া।

(২) জলাভূমি, জলাশয় (পুকুর, খাল, বিল, বাঁওড়, জলা) বুজিয়ে ফেলা।

(৩) পাখিদের বাসস্থান, নির্জনতার অভাব, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করা।

(৪) পাখিদের খাদ্যে টান, বট, অশ্বত্থ, ডুমুর ইত্যাদি গাছ কমে যাওয়া এবং সাপ, ব্যাঙ, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ইত্যাদির সংখ্যা কমে যাওয়া।

(৫) চাষবাসে কীটনাশক ব্যবহার, বিভিন্ন সার (রাসায়নিক) ব্যবহার।

(৬) সর্বোপরি সচেতনতার অভাব, বিভিন্ন সময়ে কারণে-অকারণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাখি মেরে থাকে। এমনিতেই পরিবেশ পরিস্থিতি পাখিদের বিপক্ষে তৈরি হয়েছে। তার উপর অন্যায়ভাবে হত্যালীলা চালাই আমরা। যদিও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন আছে।

১৯৭২ সালের ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী পায়রা, পাতিকাক ছাড়া ভারতীয় প্রজাতির যেকোনও পাখি ধরা, কেনা, বেচা, বা বন্দী করে রাখা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই ভারতীয় পাখি কেনা বা বেচা দুটিই সমান অপরাধ। আইন আছে, পাখিদেরও পরিবেশে প্রয়োজন আছে তবুও তারা আজ বিপন্ন। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে এদের ভূমিকা প্রচুর। ছোট ছোট ক্ষতিকর পোকামাকড় যাতে শস্যের ক্ষতি করতে না পারে তার অনেকটাই দেখভাল করে পাখি। আবার শামুক, গুগলী, জলজ পোকা ইত্যাদি খেয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে মাছের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতেও এদের ভূমিকা প্রচুর। তাই পাখি সংরক্ষণ জীবসম্প্রদায় টিকিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।—*নিজস্ব প্রতিবেদন*

শ্বেত বামন

১ পাতার পর

নক্ষত্রের ভর আবার কিভাবে মাপা যায়? কোন দাঁড়িপাল্লায় মাপা যায়? এক জটিল পদ্ধতির সাহায্যে নক্ষত্রের ভর মাপা যায়। সূর্যের ভর প্রায় 2 x 10^{33} গ্রাম। ২-এর পর তেত্রিশটা শূন্য বসালে যত হয় তত গ্রাম হল সূর্যের ভর। তবুও সূর্য একটা অত্যন্ত হাল্কা নক্ষত্র। এক এক শ্রেণীর নক্ষত্রের পরিণতি এক এক রকমভাবে হয়। যেসব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের মধ্যে থাকে তাদের অন্তিম পরিণতি হল 'শ্বেত বামন' (White Dwarf)। এই সত্য প্রথম আবিষ্কার করেন ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যম্ চন্দ্রশেখর। শ্বেত বামন তারাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী ফাউলার ও চন্দ্রশেখর একসঙ্গে ১৯৮৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

শ্বেত বামন তারাদের কথায় আসার আগে নক্ষত্রদের সৃষ্টির কথায় আসি। যেকোন নক্ষত্রই মহাকাশে তথা মহাশূন্যে প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণনশীল গ্যাসীয় মেঘ ও ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্যাসীয় পিন্ড প্রথমে নিজস্ব মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ক্রমশ সংকুচিত ও ঘন হতে থাকে। সংকুচিত হওয়ায় প্রথমে কেন্দ্রের চাপ ও পরে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এইভাবে তাপমাত্রা যখন ১০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনে (১০০ লক্ষ ডিগ্রি কেলভিন) পৌঁছায় তখনই ওই গ্যাসীয় মেঘের কেন্দ্রে শুরু হয় তাপকেন্দ্রীয় বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটা হিলিয়ম পরমাণুতে পরিণত হয়। আরও হয় বিপুল পরিমাণে তাপশক্তি ও আলোকশক্তি। এই অবস্থাই হল এক পরিপূর্ণ নক্ষত্রের অবস্থা। এই অবস্থায় যেসব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের কম তাদের কেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া একসময় বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় নক্ষত্রটির কেন্দ্র সংকুচিত হতে শুরু করে। নক্ষত্রগুলোর কেন্দ্রে একটা বহির্মুখী চাপ তৈরি হয়। ফলে নক্ষত্রটির সংকোচন-প্রসারণ বন্ধ হয়ে সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়। বহির্মুখী এই চাপের নাম অপজাত চাপ (Degeneracy Pressure)। এই অবস্থায় নক্ষত্রটিকে শ্বেত বামন বলে। এদেরকে অপজাত নক্ষত্রও বলে।

শ্বেত বামন তারাদের ব্যাসার্ধ খুবই কম কিন্তু ভর ও ঘনত্ব বিশাল। একটা চামচের ওপর যদি একটা শ্বেতবামনকে রাখা যায় তাহলে তার ভর হবে কয়েক লক্ষ টন। সাধারণত যে কোন নক্ষত্রের ভর বেশি হলে তার ব্যাসার্ধও বেশি হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে চন্দ্রশেখর দেখালেন শ্বেত বামন তারাদের ভর বাড়ার সাথে সাথে ব্যাসার্ধ কমতে থাকে। এইসব নক্ষত্রের বাইরের তলের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি। আয়তন খুবই কম হওয়ায় এদের ঔজ্জ্বল্য কম অর্থাৎ এরা কম পরিমাণে আলো বিকিরণ করে। এইসব ইলেকট্রন ও আয়ন। এইসব ইলেকট্রনদের শক্তি অত্যন্ত বেশি আর বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি। শ্বেত বামন তারাদের কেন্দ্রে কোন শক্তি উৎপন্ন হয় না। শ্বেত বামনে পরিণত হওয়ার আগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাই তারা বিকিরণ করতে থাকে। একসময় এরা মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়। লুব্ধক-খ (Serius-B) এইরকমই একটা শ্বেত বামন তারা। আমরা এখনও একে আকাশে দেখতে পাই।

সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর ১৯৩০ সালে শ্বেত বামন সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করেন। সেইসব আবিষ্কার তখনই সমাদৃত হয়নি বিজ্ঞানী মহলে। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন ও সমসাময়িক কিছু বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের বিরোধিতা করেছিলেন। নীল্‌স বোর কিন্তু তাঁর তত্ত্বকে মেনে নেন। এডিংটন যদি রিরোধিতা না করতেন তাহলে ১৯৮৩ সালে অনেক আগেই চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হতেন। অথচ চন্দ্রশেখর এডিংটনকে সারাজীবন শ্রদ্ধা করে এসেছেন।

যাইহোক, সত্য দেরী করে হলেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। আর একটু বলার আছে। কোন নক্ষত্র শ্বেত বামনে বিবর্তিত হওয়ার আগে 'লাল দানব'-এ (Red Giant) পরিণত হয়। তখন তার আয়তন ও ঔজ্জ্বল্য হয় অস্বাভাবিক, অভাবনীয়। আমাদের সূর্যও একদিন শ্বেত বামনে পরিণত হয়ে মহাকাশে লীন হয়ে যাবে। তবে তার আগেই সূর্য লাল দানব হয়ে বৃহস্পতি পর্যন্ত সমস্ত গ্রহকে গ্রাস করে উদরস্থ করবে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সূর্য এই অবস্থায় আসতে সময় নেবে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর।

—কাকলি সরকার

অরণ্য সপ্তাহে

জগন্ময় মজুমদার

অরণ্য সপ্তাহ যায়
আমার একটাও গাছ বোনা হয় না
প্রতি জন্মদিনে আমি কোনো প্রদীপ জ্বালি না
গুণে গুণে বুনে দেই উদ্ভিদের চারা
গতবার মহুয়া বুনেছি, বাদাম, কদম, শিশু
রাস্তার দুপাশে সুবাউল
তারও আগে তারও আগে ...
কুন্তলী চাঁপায় ধরেছিল ফুল
আশ্বিনে জন্ম আমার
অরণ্য সপ্তাহে জন্মান্তর ...
এত গাছ আমি বুনবো কোথায়
হে আকাশ প্রহরী
কোথায় রাখবো আমি তোমাকে এখন?
পাখির ডানার কাছে রয়ে গেছে ঋণ
উড়ে যেতে যেতে কেবল ছড়ায়
অর্ধভুক্ত বীজ
তুমি কী পারো না,
তুমিও তো পারো মেঘমল্লার
ছড়িয়ে যেমন যায় যোজন
যোজন শুভ কল্যাণ ...
একদিন গাছ হবে মেঘ,
মেঘ হবে ধারাস্নান
শিখে নেবে ক্লোরফিলে বর্ণালী বিজ্ঞান

HP GAS your friendly gas
H.P. GAS
(A Govt. of India Enterprise)
By Hindustan Petroleum Corpn. Ltd.
Distributor
Kanchrapara
H.P. Gas Service
30, Rajani Babu Rd.,
Kanchrapara
Ph: 2585-5221
(New Connection available here Rs. 1850 only, including Oven, Accessories & Insurance)

কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণান

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্সে রামন তাঁর অফিস ঘরে বসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা বিখ্যাত জ্যোর্তি পদার্থবিদ অধ্যাপক এস চন্দ্রশেখরের পিতা। হঠাৎ দৌড়ে এসে ঢুকলেন কে এস কৃষ্ণান এবং জানালেন আর্থার কম্পটন ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এক্স রে বিকিরণের বিক্ষেপন (Scattering) নিয়ে কাজের জন্য। রামন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'ভালো খবর, সত্যি খুব ভালো। শোনো কৃষ্ণান এক্স রে-র বেলায় যা সত্যি আলোর ক্ষেত্রেও তা সত্যি হতে হবে। আমি সব সময় তা মনে করি। কম্পটন প্রভাবের অনুরূপ আলোরও প্রভাব থাকতে হবে। আমাদের প্রমাণ করতেই হবে, আমরা ঠিক পথেই চলেছি। প্রমাণ আমরা পাবই এবং সেই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার।'

হ্যাঁ প্রমাণ তাঁরা পেয়েছিলেন। তাঁদের গবেষণার সারবস্তু ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে প্রকাশিত নেচার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। নেচারের আধ পাতা কলমে মাত্র ৫১ লাইনে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সারাংশ একটি বাক্যে বলা আছে—ধূলিহীন তরল ও গ্যাস বিক্ষেপণের ফলে প্রত্যেকটিতে ব্যপ্ত আলোর মধ্যে মুখ্য রশ্মির আলোক তরঙ্গের সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো তো থাকেই, তার সঙ্গে থাকে পরিবর্তিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিক্ষেপিত বিকিরণ।

কিন্তু নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন রামন। ১৯৩০ সালে। অভিযোগ আছে রামন নাকি কৃষ্ণানকে বঞ্চিত করেছিলেন তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে। 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কার সংক্রান্ত কৃতিত্বের ব্যাপারেও। এ প্রসঙ্গে Current Science পত্রিকায় রামশেষণের লেখা 'A conversation with K.S. Krishnan on the story of the Discovery of the Raman Effect' প্রবন্ধের একটা জায়গার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রামশেষণ : ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারিতে আপনি যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে না ঢুকতেন তা হলে কি ভারত এই নতুন এফেক্ট আবিষ্কার মিস করত না?

কৃষ্ণান : এটা সম্ভাবনার কথা। অস্বস্তিকর প্রশ্ন। আমাকে যদি সততার সঙ্গে জবাব দিতে হয় তা হলে প্রফেসরের চরিত্র টেনে কথা বলতে হবে। ... আমি শুধু এইটুকুই বলব, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আবিষ্কারটা ত্বরান্বিত করার। পরবর্তীকালে রামনের ভাইপো, কৃষ্ণানের বন্ধু সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর রামশেষণের এক প্রশ্নের জবাবে জানান— '... রামন এফেক্ট আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে দুজন ভীষণ মৌলিক চিন্তাশীল বিজ্ঞানী একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছিলেন।'

কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণানের জন্ম ১৮৯৮ সালের ৮ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার ওয়াত্রাপ গ্রামে। পিতা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। কৃষ্ণানের প্রাথমিক পড়াশুনা গ্রামে। শ্রী ভিল্লিপুত্তর শহরে হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে মাদুরাইতে আমেরিকান কলেজে পড়াশুনা করেন। তারপর মাদ্রাজের ক্রিশ্চান কলেজে। এরপর এই ক্রিশ্চান কলেজেই চাকরি ডেমনস্ট্রেটর পদে। বাইশ বছর বয়সে কৃষ্ণান কলকাতায় আসেন। কাল্টিভেশন অব সায়েন্সে রামনের সহকারী হিসাবে গবেষণায় যোগ দেন। রামনের সান্নিধ্যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সত্যেন বসুর অধীনে রিডার হিসাবে যোগ দেন। আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯৩৩-এ। কাল্টিভেশনের সেই গবেষণাগারে। রামনের পদে।

রামন এফেক্ট নিঃসন্দেহে এক বড় আবিষ্কার। আর তাতে কৃষ্ণানের ভূমিকা— তা সে যতটাই হোক— অনস্বীকার্য। এর পরেও অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন এই বিজ্ঞানী যেগুলি রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণান চৌম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। পিয়ের ক্যুরি, ভাইস ও লাঁজভাঁ প্রবর্তিত ধারা অবলম্বন করে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের চৌম্বকত্ব বিশ্লেষণ করেন তিনি ও রামন। ত্রিশের দশকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স যখন নতুন নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে পদার্থবিদ্যার, তখনই কৃষ্ণান তার সাহায্য নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কিংবা পূর্বাভাস দিয়েছেন নানারকম পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের। এক্স রশ্মি বিচ্ছুরণের সাহায্যে কেলাসের অভ্যন্তরে অণুসমূহের অবস্থান মাত্র জানা যায় কিন্তু কেলাসের সম্পূর্ণ গঠন অর্থাৎ পারস্পরিক দিকস্থিতি (Orientation) জানতে হলে তার সঙ্গে বিষমসারকতা (Anisotropy) নির্ণয়ও সংযোজিত করতে হবে। কৃষ্ণানের এই বিষমসারকতা নির্ণয়ের কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। তাঁর নিজের তৈরী যন্ত্র— যা আজ কৃষ্ণান ব্যালেন্স নামে পরিচিত, তার সাহায্যে বিষমসারকতা নির্ণয় করা যায়। আজ পৃথিবীর বহু গবেষণাগারে কৃষ্ণান ব্যালেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে। কাল্টিভেশন অব সায়েন্সে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষ্ণানের নিজের তৈরী যন্ত্রটি। এক সময় তিনি তাত্ত্বিক গবেষণায় আগ্রহী হন। এ বি ভাটিয়ার সঙ্গে তিনি ধাতব পদার্থের পরিবাহিতার সূত্র সন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। তাঁদের গবেষণার মূল বক্তব্য ছিল যেকোনও ধাতুর প্রতিরোধকতা নির্ধারণ করতে হলে তার কের্মিপৃষ্ঠে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলির মধ্যে মুক্তপথ (mean free path) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে নির্ধারণ করতে হবে। ইলেকট্রন তরঙ্গের গতিপথ যদি ধাতব পদার্থের দূষণের উপস্থিতির জন্য প্রতিহত হয় তা হলে প্রতিরোধ্যতা ও দূষণের পরিমাণের আনুপাতিক সূত্র হিসেব করা সম্ভব। অপরদিকে ইলেকট্রন তরঙ্গ যদি কেলাসের ল্যাটিস কম্পন তরঙ্গ দ্বারা প্রতিহত হয় তা হলে পাওয়া যাবে প্রতিরোধ্যতা ও তাপমাত্রার আনুপাতিক সূত্র। এইসব সূত্রগুলি আজ বিশুদ্ধ ধাতু, সংকর ধাতু ও তরল ধাতুর বৈদ্যুতিক প্রতিরোধকতা গবেষণায় গোড়ার কথা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধানের পদ ছেড়ে দিল্লিতে আসেন। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর হন। বিজ্ঞানী হিসাবে অবদানের জন্য দেশে বিদেশে বহু একাডেমী এবং সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। 'ভাটনগর' পুরস্কার পান। ষাটবছর বয়সে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এফ আর এস হন। ১৯৬১ সালে ১৪ জুন হার্ট অ্যাটাকে কৃষ্ণানের জীবনাবসান ঘটে।

ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী আর সুন্দরম যিনি একসময় ছিলেন কৃষ্ণানের সরকারী গবেষক লিখেছেন, 'বিদেশের বিজ্ঞানীমহলে সি ভি রামনের পরিচিতি ছিল আলোক বিচ্ছুরণের মহাপণ্ডিত হিসেবে। মেঘনাদ সাহা বিদিত ছিলেন বড় জ্যোর্তিপদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে। সত্যেন বসুকে সকলে জানত তিনি মস্ত বড় তাত্ত্বিক, বোসন কণাদের কথা বলেছেন। হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার খ্যাতি ছিল মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে সুপণ্ডিত হিসাবে। কিন্তু কে এস কৃষ্ণানকে ওরা জানতেন একজন কমপ্লিট ফিজিসিস্ট হিসাবে।

—গোবিন্দ দাস

অবাক পৃথিবী

১ পাতার পর

রশ্মির (Untraviolet Ray) ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে। ওজোনস্তরে সূর্যের অতিবেগুণী রশ্মি পরিশ্রুত না হলে, মানুষের ত্বকের ক্যান্সার, চোখে ছানি পড়া, এমনকি অন্ধত্ব বেড়ে যাবে। মানুষ ও সব প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। উদ্ভিদকুলও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবন বিপন্ন হবে। এমনকি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। এই ওজোনস্তর আগের মত সুস্থ নেই। বিভিন্নভাবে ওজোনস্তর ক্ষয়ে (Depletion) যাচ্ছে, ওজোন স্তরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সহজেই অতিবেগুণী রশ্মি পৃথিবীতে চলে আসছে। লক্ষ্য করা গেছে ১৯৮৪ সাল নাগাদ আন্টার্কটিকার উপরের ওজোনস্তর ৪০ শতাংশ ওজোন কমে গেছে, এরও পরে ওই অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় ওজোন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এই অঞ্চলকে এজন্য 'Antarctic ozone hole' বলা হয়। ধারণা করা হয়, ওজোনস্তরে ১ শতাংশ ওজোন কমে গেলে ৬ শতাংশ ত্বকের ক্যান্সার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। ওজোনস্তর ধ্বংস হওয়ার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষ ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এখানে 500 Supersonic Transport Aircrafts (বোয়িং বিমান) থেকে নির্গত বিভিন্ন নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NOx) প্রায় ১২ শতাংশ ওজোন ধ্বংস করেছে।

ওজোনস্তরে ওজোন তৈরী ও ধ্বংস : ওজোনস্তরে প্রতিনিয়ত আনবিক অক্সিজেন (O_2) ও পারমানবিক অক্সিজেন (O) সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে ফিউসনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে ওজোন তৈরি হয় ($O_2 + O = O_3$)। পুনরায় ওজোন ভেঙে আনবিক অক্সিজেন ও পারমানবিক অক্সিজেন তৈরি হয় অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে। ওজোন স্তরে ওজোন গড়া ও ভাঙার কাজ চলছে প্রতিনিয়ত। সাধারণভাবে বলা যায় এই ভাঙা গড়ার কাজে ব্যস্ত থাকায় অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছনোর সুযোগ পায় না। কিন্তু এই স্তরে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, হ্যালোন, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, সালফেট ঘটিত এ্যারোসল বিভিন্নভাবে ওজোন স্তরে প্রবেশ করে। এগুলিই ওজোন স্তরে প্রবেশ করে ওজোন ধ্বংস করে চলেছে। এদের মধ্যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CCl_2F_2; CFC) ওজোন ধ্বংস করার জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী। CFC এর ক্লোরিন ওজোন স্তরে অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে মুক্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লোরিন সহজেই ওজোনের সাথে মিশে প্রথমে ক্লোরিন অক্সাইড ও অক্সিজেন অনু তৈরী করে। পরে ক্লোরিন অক্সাইড ও পারমানবিক অক্সিজেন বিক্রিয়া করে ক্লোরিন ও আনবিক অক্সিজেন তৈরী করে। (বিক্রিয়াগুলি হল : $CCl_2F_2 + UV\ ray \rightarrow Cl + CClF_2$; $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$; $ClO + O \rightarrow Cl + O_2$) এভাবে বারবার আনবিক অক্সিজেন তৈরি করে মুক্ত ক্লোরিন ওজোন স্তরে থেকে যায়। ফলে অনবরত ওজোন বিশ্লিষ্ট করার কাজটি করে। ওজোন স্তরে প্রবেশ্য CFC-এর গড় আয়ু ১০০ বছর। অর্থাৎ ১০০ বছর সক্রিয় থাকবে এবং ওজোন বিশ্লিষ্ট করার কাজটি করবে। ফলে অতিবেগুনী রশ্মির ভাঙা-গড়ার কাজ বিঘ্নিত হয় এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় অতিবেগুনী রশ্মি। কোথা থেকে এল এই CFC ? পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি ১৯৩০ সাল থেকে CFC এবং হ্যালোন উৎপন্ন করতে থাকে। কারণ এই গ্যাসগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় শীততাপ নিয়ন্ত্রকের কাজে, রেফ্রিজারেশনে কাজে, বড় অগ্নিনির্বাপকে ও পরিস্কারকের (কম্পিউটার চিপস্ পরিষ্কারক পরিষ্কার করার ফোম) কাজে। CFC হল মিথেন ও ইথেনের বিভি ক্লোরিন ও ফ্লুরিন প্রতিস্থাপক জাতক। হ্যালোন হল মিথেন ও ইথেনে বিভিন্ন ব্রোমিন ও ফ্লুবিন প্রতিস্থাপক জাতক।

ওজোন স্তর ক্ষয়ের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে CFC-এর উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার কথা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তবে শুধু CFC নয়, অন্যান্য কয়েকটি ইথেনজাতক (ফ্রেয়ন 113, 114 115, CCl_2F) ও হ্যালোনও (CF_2BrCl, CF_3Br) ওজোনস্তরের একইরকম ক্ষতি করে। শীততাপ নিয়ন্ত্রক, রেফ্রিজারেশন ও বড় অগ্নিনির্বাপকে এগুলির ব্যবহার এখনও চলছে। যেজন্য ওজোন স্তরের সুস্থতা রক্ষায় সমস্তরকম CFC সমতুল্য উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। যদিও যে পরিমাণ CFC ও সমজাতীয় ক্ষতিকারক উপাদান তাদের গড় আয়ু ১০০ বছর পর্যন্ত ওজোন ক্ষয়ের (Depletion) কাজ চালিয়ে যাবে।

বায়ুর নিম্নস্তরে সাধারণ দূষণ : বায়ুর বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থ গুলিই ওই স্তরের বায়ুর উপাদান। কিন্তু বিভিন্ন কারণে (প্রাকৃতিক ব মনুসৃষ্ট) অন্যান্য বেশ কিছু গ্যাসীয় উপাদান বায়ুতে মিশে যাচ্ছে। যেমন আমাদের ট্রপোস্ফিয়ারে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ইত্যাদি গ্যাসগুলি উপস্থিত থাকে। এখন বিভিন্নভাবে বায়ুতে কয়েকটি ক্ষতিকর গ্যাস মিশে বায়ু দূষিত করে চলেছে। সাধারণ বায়ু দূষক গ্যাসগুলি হল — (১) কার্বন মনোক্সাইড (CO), (২) নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ (NOx) ও সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), (৪) হাইড্রোকার্বন সমূহ এবং (৫) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা বা কলয়ডীয় কণা (Particulates)। এই সবগুলি গ্যাসই জীবকুলের পক্ষে ক্ষতিকর। এই গ্যাসগুলি প্রাকৃতিকভাবে মিশতে পারে অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, উষ্ণ প্রস্রবন ইত্যাদি থেকে। এই গ্যাসগুলির মনুষ্য সৃষ্ট উৎস হল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিভিন্ন কারখানা, বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক কারখানা, মোটর যানবাহন, শীততাপ নিয়ন্ত্রক, ঘর উত্তাপন যন্ত্র ইত্যাদি।

বায়ু দূষক গুলির ক্ষতিকর দিক : বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইড-এর মাত্রা বাড়লে মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বায়ুতে CO এর গাঢ়ত্ব 10 ppm থাকলে আমাদের বিচার শক্তি নষ্ট হয়, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়, 100 ppm হলে মাথা ব্যাথা, মাথা ঘোরা, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করা যায়। 500 ppm হলে বমির উদ্রেক হয়, কাঁপুনি সহ মাথা ধরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করা যায়। 750 ppm হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। 1000 ppm Co এর গাঢ়ত্ব হলে শ্বাসরোধ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়। জানা দরকার সিগারেটের ধোঁয়ায় CO এর গাঢ়ত্ব প্রায় 400-500 ppm.

এরপর ৭ এর পাতায়

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

New Dynamic Engineer's Co-Society Ltd.
Govt. Contractors
354, Siraj Mondal Rd.
Kanchrapara. Ph: 2585-9243

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

য়সে ফুল ফোটে। *ব্যাম্বুসা ভালগারিস* প্রজাতির বাঁশগাছে ফুল হয় ১৫০ ছরে। চীনের এক প্রজাতির বাঁশগাছে ফুল হয় ১২০ বছরে। আবার কানও কোনও প্রজাতির বাঁশগাছে ফুল ফোটে ৪০-৫০ বছরে। অর্থাৎ াঁশগাছে ফুল ফোটা কোনও বিরল ঘটনা নয়, একটি নিয়মিত ঘটনা। বে সময়কাল সুদীর্ঘ বলেই অস্বাভাবিক লাগে এবং মানুষের মধ্যে ভয় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তাই বাঁশগাছে ফুল ফোটার সাথে বন্যা জাতীয় র্যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য, বাংলা ১৩৪৯ সালে (১৯৪২) াদিনীপুরে (বর্তমানে পূর্ব) বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বাঁশগাছে ফুল টেছিল এবং ওই বছরই ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক বন্যা আছড়ে পড়েছিল। বছর য়েক আগেও মেদিনীপুরের (পূর্ব) কিছু এলাকায় বাঁশগাছে ফুল দেখা য়েছিল কিন্তু এবছর ওইরকম বন্যা হয়নি।

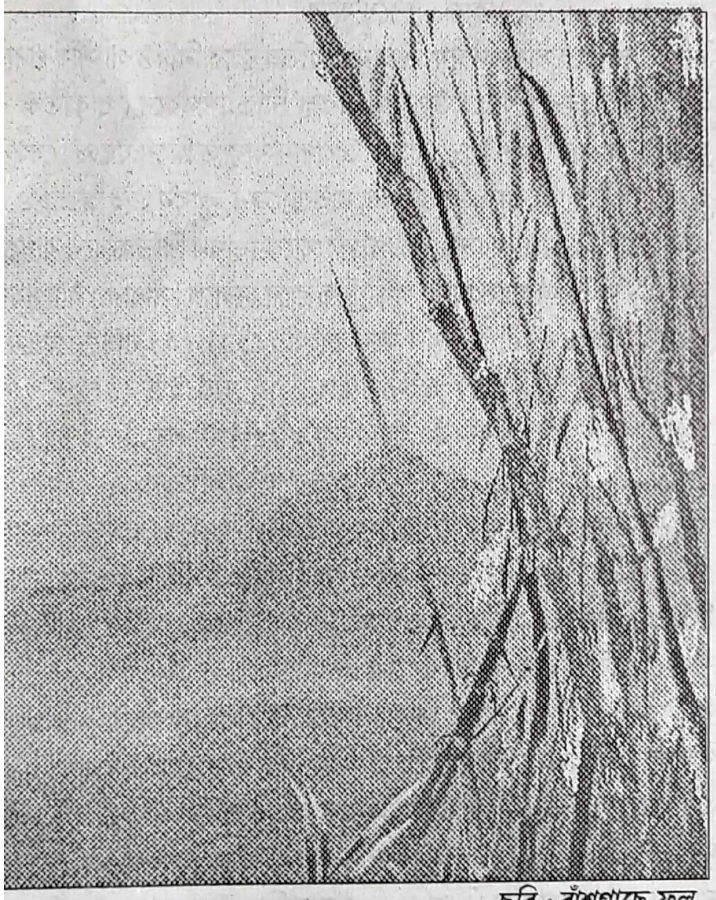

ছবি : বাঁশগাছে ফুল

তবে বাঁশগাছে ফুল ফুটলে বিপদ হয় অন্য দিক থেকে। বাঁশগাছে যে ুল হয় তা থেকে প্রচুর পরিমাণে বীজ হয়। এমন পরিসংখ্যান আছে যে াঁশগাছের ফুল থেকে প্রতি বর্গগজে হওয়া গাছ থেকে গড়ে ৮০ পাউন্ড র্যন্ত বীজ পাওয়া যেতে পারে। এই বীজ প্রোটিন খুবই সমৃদ্ধ। এই বীজ াওয়ার জন্য ইঁদুরের দল বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসে। পুষ্টিকর এই ীজ খেয়ে তাদের প্রজননও বাড়ে। এবং ইঁদুরের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ীজ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। সমস্যা তৈরী হয় এখানেই। এই প্রচুর সংখ্যক দুর খাবারের সন্ধানে ছুটে যায় শষ্যক্ষেতে এবং শষ্য সঞ্চিত রাখা খামারে। ার ফলেই দেখা দেয় শস্যাভাব, যারই ফলশ্রুতি দুর্ভিক্ষ। মিজোরামে ১৯৭৬ ালে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাঁশগাছে ফুল ফোটার পর সরকারপক্ষ অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় মানুষদের ইঁদুর মারার উৎসাহ দিয়েছিল, তখন প্রায় ৫ লক্ষ ইঁদুরের লেজ জমা পড়েছিল অর্থাৎ ৫ লক্ষ ইঁদুর মারা হয়েছিল তখন। তারপর ১৯৭৮ সালে ইঁদুরের লেজ জমা পড়েছিল ২৬ লক্ষ।

এছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে বিপদ সৃষ্টি হয় অন্যভাবে। পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে বাঁশের বন, সেখানকার মাটি বাঁশগাছের গুচ্ছমূল আঁকড়ে ধরে রাখে। কিন্তু বাঁশগাছে ফুল ফোটার পর গাছগুলি মারা যায়, ফলে ওই অঞ্চলের মাটি আলগা হয়ে যায়। বৃষ্টির সময় ধস নামা শুরু হয়। ১৯৯২ সালে আইজলে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ব্যাপক ধস নামে এবং ধসে প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু হয়। ওই অঞ্চলে কয়েক মাস আগে বাঁশগাছে ফুল ফুটেছিল এবং বাঁশগাছগুলির মৃত্যুর ফলেই ওই ধস নেমেছিল বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ বাঁশগাছে ফুল ফুটলেই বন্যা থেকে দুর্ভিক্ষ যেকোনও ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে তা নয়। তবে শস্যভাড়ারে টান পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেজন্য ওই এলাকায় ইঁদুর মারার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এমনকি ইঁদুর খাবে না এমন শস্য যেমন আদা, রসুন, হলুদ ইত্যাদি চাষ করার জন্য স্থানীয় চাষীদের পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। এইসব কর্মসূচী গ্রহণ করে ঘটনাটির মোকাবিলা করা সম্ভব। ব্যাপারটিকে অলৌকিক ঘটনা বলে বিবেচনা না করে, ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে না দিয়ে, বাস্তব প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

জলাভূমি বাঁচাতে অর্ডিন্যান্স

জলাভূমি বাঁচাতে বিজ্ঞানকর্মীরা বেশ কয়েকবছর ধরেই আন্দোলন তথা আইনি লড়াই চালিয়ে আসছে। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, বিজ্ঞান দরবার, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন। সবরকম চাপের কাছে সরকারকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতেই হল। প: ব: সরকার গত ১৬ নভেম্বর ইস্ট কলকাতা (কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০০৫ জারি করেছেন। এই অর্ডিন্যান্সে জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে এবং জলাভূমি নষ্ট করার বিষয়টিকে জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

জলাভূমি কর্তৃপক্ষের হাতে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে — (১) পূর্বকলকাতার জলাভূমিতে যেকোনওরকম অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করা হবে। (২) জলাভূমিতে কোনওরকম অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করা হবে। (৩) জলাভূমির প্রাণী, উদ্ভিদ ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য যাতে অক্ষুন্ন থাকে। (৪) নোংরা জলে মাছ চাষ করা হবে। (৫) জলাভূমি বুজিয়ে যেসব বাড়ি বা নির্মাণকার্য তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি ভেঙে ফেলতে হবে এবং জলাভূমিগুলি পুনরায় উদ্ধার করা হবে। (৬) জলাভূমির গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া হবে।

জলাভূমি বিষয়ক এই অর্ডিন্যান্সটি আগামী ২০০৬ ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভায় পেশ করা হবে। বিজ্ঞান ও পরিবেশকর্মীদের সর্বদাই নজরদারি রাখতে হবে যাতে জলাভূমি কোনওভাবেই নষ্ট হয়ে না যায়।

—সংবাদদাতা

অবাক পৃথিবী

৫ পাতার পর

বায়ুতে সালফার ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়লেও বিভিন্ন শারিরীক অসুস্থতা লক্ষ্য করা যায়। বায়ুতে SO_2 এর গাঢ়ত্ব 1 ppm হলে শ্বাস কষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানি সৃষ্টি করে। 3-5 ppm হলে ঝাঁঝালো গন্ধ, তীব্র শ্বাস কষ্টের সৃষ্টি করে। এবং যদি SO_2 এর গাঢ়ত্ব 50-100 ppm তাহলে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হবে। এছাড়াও বায়ুতে SO_2 উপস্থিত থাকলে বায়ুর জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী হয় এবং বৃষ্টির সাথে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। অন্যান্য বায়ুদূষক গুলিও শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি ফুসফুসের রোগের জন্য দায়ী।

অম্ল বৃষ্টি : বায়ু মণ্ডলের কিছু কিছু গ্যাসীয় উপাদান রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে অ্যাসিড গঠন করে। বৃষ্টির জলের সাথে এই অ্যাসিড মিশে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে অ্যাসিড বৃষ্টি বলে (অম্ল বৃষ্টি)। অ্যাসিড বৃষ্টির সাধারণ অ্যাসিডগুলি হল কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ও নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)। বায়ুর কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বৃষ্টির জল মিশে কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে। আবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বায়ুতে সালফেট, নাইট্রেট, কার্বনেট প্রভৃতি আম্লিক গ্যাস বাতাসে মেশে। পরে জলের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যাসিড গঠন করে এবং বৃষ্টির সাথে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

যেমন $2SO_2 + O_2 = 2SO_3$, $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$;

$NO_2 + O_3 = NO_3 + O_2$, $NO_3 + NO_2 = N_2O_5$, $N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$

এই সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টি বা সালফিউরিক অ্যাসিড যুক্ত কুয়াশা মার্বেল পাথর নির্মিত ইমারত, মূর্তি, স্তম্ভ ইত্যাদির ক্ষয়সাধন করে। এই অবস্থাকে Stone Leprosy বা পাথরের কুষ্ঠ বলে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ —

$CaCO_3 + H_2SO_4 = CaSO_4 + CO_2 + H_2O$

আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা (Photo chemical Smog) : ১৯৫২ সালের ৫-৯ ডিসেম্বর লন্ডনে এমন ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল যে ওই ধোঁয়ার প্রকোপে প্রায় ৪০০০ মানুষ মারা গেল। আরও এমন অনেক ঘটনা আছে যে, ধোঁয়ার কবলে মারা গেল মানুষ। আসলে এগুলি সাধারণ ধোঁয়া নয়, এগুলি ধোঁয়াশা, আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা। আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা কি? যানবাহনের ধোঁয়া, এবং অন্যান্য উৎস থেকে আসা নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, CO, O_3, H_2O_2 অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি তীব্র সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে। ধোঁয়াশার মধ্যে থাকলে চোখ ও নাকে জ্বালা সৃষ্টি হয়, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়। ধোঁয়াশার ফলে ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও চোখের বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। আর ধোঁয়াশায় দূষিত গ্যাসীয় উপাদানগুলির মাত্রা বেশী হলে মৃত্যুও ঘটে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ : যেসব মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বায়ুতে দূষক গ্যাসগুলি বাতাসে মিশছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। যেমন, তাপবিদ্যুৎ এর পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ ইত্যাদি উৎসগুলি কাজে লাগাতে হবে। মোটর যানবাহনের ইঞ্জিন আরও উন্নত করা দরকার যাতে জ্বালানীর সম্পূর্ণ দহন হয়ে CO_2 উৎপন্ন হয়। সালফারহীন বিকল্প জ্বালানী, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা দরকার। কলকারখানাগুলিকে ধোঁয়া ছাড়ার জন্য সীমা বেঁধে দেওয়া, সাথে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে, যত্রতত্র গাছ কেটে ফেলা বন্ধ করতে হবে। জলাভূমিগুলি (নদী, খাল, বিল, পুকুর) সংরক্ষণ ও সংস্করণ করে জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। জলাশয়গুলি পরিস্কার রাখতে হবে। জানা দরকার জলাভূমিগুলি কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদের সাহায্যে বায়ুদূষক গ্যাসগুলি শোষণ করে নেয়।

সুস্থ পরিবেশে নির্মল বাতাস পেতে হলে, প্রতিটি দূষণ সৃষ্টিকারী উৎসগুলির উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। পরিবেশকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার স্বাভাবিক সুস্থতা। সেক্ষেত্রে আমরাও বাঁচব, বাঁচবে আমাদের পৃথিবী।

—পান্নালাল মানি, বিজ্ঞানদরবার, কাঁচরাপাড়া

গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমাধানের সহজ উপায়

পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পকেই দায়ী করা হয়। এরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নির্গত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে শোষণ করে এবং কিছুটা বিকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে ফেরত পাঠায়।

আমেরিকার জীববিজ্ঞানী জন মার্টিন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি রোধ করার সহজ এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। দক্ষিণ মেরু বা আন্টার্কটিকা মহাদেশে মানুষের বসতি নেই। ভূমি (Land) বরফের অনেক নীচে অবস্থিত। বাতাসে ধূলিকণাও নেই। তাই সমুদ্রে লোহার উপস্থিতি নেই। তাই সমুদ্রে ফাইটোপ্লাংকটন্ প্রায়ই দেখা যায় না।

বিজ্ঞানীরা সমুদ্রে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন জলে লোহার উপস্থিতি বৃদ্ধি করলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন চারদিনে সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৯ গুণ বৃদ্ধি করতে পারে। এক হিসেবে দেখা গেছে ৩ লাখ টন লোহার উপস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অর্ধেক কমে যায়।

জন মার্টিন জানিয়েছেন হাজার হাজার টন বাজে লোহা-লক্কড় দক্ষিণমেরু বা আন্টার্কটিকা মহাদেশের গায়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে পারলেই প্রচুর গুল্ম ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন জন্মাবে এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করবে। এরা দ্রুত কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নেবে। ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

—সংবাদসূত্র : নেচার

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন। মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই পাঠাবেন।

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান

রক্তদান শব্দটির সাথে আজ আমরা পরিচিত। মুমূর্ষু রোগীকে সুস্থ মানুষের দেহ থেকে রক্ত দিয়ে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা যায়। আবার রক্তদাতার শরীরে রক্তের ঘাটতিও পুরণ হয়ে যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। এখন আমরা পরিচিত হব দেহদান ও চক্ষুদানের সাথে।

মৃত্যুর পর আমাদের দেহটা যদি পুড়িয়ে বা কবরে না দিয়ে দান করে দেই তবে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে আসবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগে মরদেহ। শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা, অজানা, নতুন রোগের গবেষণা করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় মরদেহ।

শুধু গবেষণার জন্য নয়, জীবিত মানুষের কিছু খারাপ হয়ে যাওয়া অঙ্গ, মৃত মানুষের দেহ থেকে প্রতিস্থাপিত করা যায়। আমাদের দেহে যেসব অঙ্গ দুটো অথচ দুটোই খারাপ বা যেসব অঙ্গ একটি এবং সেটিই খারাপ, তখন অন্যের দেহ থেকে সেই অঙ্গ পরিবর্তন করে আরও অনেকদিন সুস্থতা ফিরে পাওয়া যায়। একে বলে অঙ্গপ্রতিস্থাপন (Organ Transplantation)। মৃত মানুষের দেহ থেকে যে যে অঙ্গগুলি প্রতিস্থাপিত করা যায় সেগুলি হল : অচ্ছোদপটল (Cornea), হৃৎপিণ্ড (Heart), যকৃৎ (Lever), বৃক্ক (Kidney), চামড়া (Skin), রক্ত (Blood), ফুসফুস (Lungs), অগ্ন্যাশয় (Pancreas), অস্থি (Bone), অস্থিমজ্জা (Bone Marrow), হৃৎপিণ্ড কপাটিকা (Heart Valve), কর্ণপটহ (Eardrum) প্রভৃতি।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে হলে মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক মৃত্যুর (Brain Death- যখন মস্তিষ্কের সবরকম কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়) পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। যেমন- মৃত্যুর ৩৫ মিনিটের মধ্যেই কিডনি বার করে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে বা মৃত্যুর চার ঘণ্টার মধ্যে চামড়া, অস্থি, অস্থিমজ্জা এবং ছয় ঘণ্টার মধ্যে কর্নিয়া, কর্ণপটহ সংগ্রহ করতে হবে। কতটুকু লাভ এই অঙ্গ প্রতিস্থাপনে?

দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষকে মৃত মানুষের কিডনি দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। দুরারোগ্য ব্যাধি 'সিরোসিস অব লিভার'-এ আক্রান্ত রোগীকে মৃত ব্যক্তির লিভার প্রতিস্থাপন করে বাঁচিয়ে তোলা যায়। ৭০ শতাংশ পুড়ে যাওয়া মানুষকে মৃত মানুষের চামড়া দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় নবজীবন। মৃত মানুষের অস্থিমজ্জা দিয়ে থ্যালাসেমিয়া, লিউকোমিয়ায় আক্রান্তদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। মৃত মানুষের হার্ট ভাল্‌ব দিয়ে একজন মৃতপ্রায় মানুষকে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়। মৃত মানুষের কর্নপটহ দিয়ে একজন বধিরকে শ্রবণক্ষম করে তোলা যায়।

শুধু এটুকু নয়, অন্ধ ব্যক্তি মৃত মানুষের চোখ পেয়ে ফিরে পায় দৃষ্টিশক্তি। এটাই 'চক্ষুদান'। চোখের যে অংশটা প্রতিস্থাপন করা যায় তাকে কর্ণিয়া বলে। চোখের বাইরের দিকে একেবারে উপরের স্বচ্ছ, পাতলা আঁশের মত অংশটিই কর্ণিয়া। আমাদের দেশে বেশিরভাগ অন্ধ ব্যক্তিই কর্ণিয়াজনিত কারণে অন্ধ। সেজন্য মৃত মানুষের চোখ দুটি না পুড়িয়ে বা কবরে না দিয়ে চক্ষুদান করলে অন্ধব্যক্তি তার দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে। মৃত্যুর ছয় ঘণ্টার মধ্যে মৃত ব্যক্তির চোখ সংগ্রহ করে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, সব মৃত ব্যক্তির চোখই কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের জন্য কার্যকরী নয়। বিশেষ কিছু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চোখের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন নিরাপদ নয়, যেমন: এইডস, ক্যান্সার, হেপাটাইটিস- বি, জলাতঙ্ক ইত্যাদি।

তবে যে কোনও বয়সের ব্যক্তিই চক্ষুদান করতে পারেন। দান করা রক্ত যেমন ব্লাডব্যাঙ্কে জমা থাকে তেমনই চক্ষু সংগৃহীত হয় চক্ষুব্যাঙ্কে (Eye Bank)। তবে অন্ধ ব্যক্তির তুলনায় দান করা চক্ষুর সংখ্যা খুব কম। তাই চাইলেই চক্ষুব্যাঙ্কে চক্ষু পাওয়া যায় না। চক্ষুদান করার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। বাড়িয়ে তুলতে হবে জনচেতনা। চক্ষুদান সম্পর্কিত বিভিন্ন কুসংস্কার বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত আছে। যেসব কুসংস্কারের সবগুলিই ভিত্তিহীন, সেগুলি পরস্পর বিরোধীও বটে। একদলের মধ্যে প্রচলিত আছে চক্ষুদান করলে পরজন্মে অন্ধ হয়ে জন্ম নেবে, যেখানে পরজন্ম বলেই কিছু নেই, সেখানে অন্ধ হওয়ার তো প্রশ্নই নেই। বৌদ্ধধর্মে অবশ্য চক্ষুদান একটি মহৎ সেবাধর্ম। জাতি ধর্মের কথা না ভেবে, প্রশ্রয় না দিয়ে, অন্ধ মানুষকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে চক্ষুদান করা (অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য) আশু কর্তব্য হওয়া উচিত।

গত ২০০৫ সালের ২৭শে নভেম্বর আরও বড় দিগন্তের দেখা দিল চিকিৎসা বিজ্ঞানে। ফ্রান্সে ৩৮ বছর বয়সী এক মহিলা কুকুরের আক্রমণে মুখের স্বাভাবিকত্ব হারিয়েছিলেন। ক্রমশ বিকৃতি ছড়ানো তাঁর মুখে চলবে অস্ত্রোপচার। অবশ্য সুন্দরভাবে পাওয়া গিয়েছিল মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটা আর এক মহিলার মুখমণ্ডল, যিনি দান করেছিলেন তার দেহ। প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে ফ্রান্সের আমিয়েন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে চলেছিল এই সফল অস্ত্রোপচারটি। এই প্রথম কোথাও মুখের অংশবিশেষ প্রতিস্থাপিত হল।

এর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়া রোগীরা দান করা মৃতদেহের অঙ্গ পেয়ে সুস্থতা ফিরে পেয়েছেন, পেয়েছেন নবজীবন। তবে সকলেই যে পাচ্ছে বা সহজেই যে পাওয়া যাচ্ছে— তা নয়। সেরকম উন্নত পরিস্থিতি এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে অর্থনৈতিক কারণে আমাদের রাজ্যে তথা আমাদের দেশে মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদান খুবই মানানসই হবে। কিন্তু কুসংস্কার, সচেতনতা ইত্যাদি ছোট ছোট বাধা এখনও এই আন্দোলনকে গৃহবন্দী রেখেছে।

—পালাম

কৃতজ্ঞতা : সুরজিৎ পাল ও গণদর্পণ।

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। সম্পাদক মণ্ডলী— পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ। ফোন : ২৫৮৫-৬০৩২, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৩৩০৫৬০৭৮।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.